সত্তর দশকের বাংলা ছবি

সোমেশ্বর ভৌমিক

সত্তর দশকের স্মৃতিচারণে বসেই ব্রিটিশ সমালোচক পেনিলোপ হাউস্টনকে মনে করতে হয় ষাটের দশকের কথা । সিনেমার জগতে সৃজনশীলতার বিস্ফোরণ এবং সাধারণ্যে এই মাধ্যম বিষয়ে কৌতূহলের ব্যাপক প্রসার এই সময়ে ছিল লক্ষ্য করার মতো । আন্তোনিয়নি, গোদার, ভার্‌হল্‌, শ্যাব্রল্‌, রেঁনে — নাম করা যায় এরকম প্রায় পঞ্চাশজন চলচ্চিত্রকারের, এই ষাটের দশকেই যাঁদের শিল্পজীবন শু । আর সিনেমাচর্চার উদ্দেশ্যে এ-সময়ে দেশে দেশে গড়ে উঠলো ফিল্ম সোসাইটির অসংখ্য শাখা, ব্বিবিদ্যালয়ের পাঠত্রমে অন্তর্ভূত্ত হলো সিনেমার কলাকৌশল আর নন্দনতত্ত্ব ।

কিন্তু, আক্ষেপ করেছেন শ্রীমতী হাউস্টন, পরের দশটি বছরে সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা কোথায় হারিয়ে গেল । তার বদলে এলো ত্রমবর্দ্ধমান ঔদাসীন্য আর অনাস্থা । সিনেমার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এখনই সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ ঘটে নি নিশ্চয়ই । তবে শিল্পমাধ্যমটি যে অনেকখানি হারিয়ে ফেলেছে তার প্রভাব, এইটেই দুঃখের ।

কিন্তু পরপর কয়েকবারই বক্স অফিস তার রেকর্ড ভেঙেছে সত্তর দশকে । আসলে ভাঙাগড়ার এই খেলা জনপ্রিয় ছবি গুলির শিল্পউৎকর্ষের জোরে নয় । এসব ছবিতে ছিল শুধু কারিগরি কৌশলজাত কিছু দৃশ্যগত চমক (যেমন ছিল Towering Inferno, Jaws, Star Warsইত্যাদি ছবিতে) । এর বাইরে, দর্শক-বৈতরণী পার হওয়ার জন্য এদের প্রায় একমাত্র সম্বল বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ । সিনেমাই শুধু দর্শককে ভোলায় নি, ভুলিয়েছে বিজ্ঞাপনও । মায়ার এই জগৎ তৈরী করতেই ব্রিটেন-এ বিজ্ঞাপনের খরচ ১৯৭২ সালের ২২.১ লক্ষ পাউন্ড থেকে দ্বিগুণ হয়ে ১৯৭৭-এ দাঁড়িয়েছিল ৪৮.৪ লক্ষ পাউন্ড-এ আর সেই অঙ্কও দেড়গুণ হয়ে ৭৩ লক্ষ পাউন্ড-এ দাঁড়ায় ১৯৭৮ সালে !

চমকসর্বস্ব বিভিন্ন ছবি এবং সেসবের ততোধিক চমকপ্রদ বিজ্ঞাপনে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট হয়েছেন ব্রিটেনের যুবসমাজ — দর্শকগোষ্ঠীর ৭৭ শতাংশেরই বয়স ৩৫ বছরের নিচে, আর ১৫ থেকে ২৪ বছরের বয়ঃসীমাতেই আছেন ৫৬ শতাংশ । এঁরা চান ছবি দেখে ভুলতে, ভাবতে নয় । সিনেমা সম্পর্কিত মননশীল চর্চাতেই তাই যেন ভাঁটার টান । হাল্কা মেজাজের লেখাই এখন বেশি জনপ্রিয় । মননসমৃদ্ধ ছবির চেয়ে এখন শিল্পের ছোঁয়া-লাগা বিনোদনপ্রধান বাণিজ্যিক ছবিরই কদর বেশি । ফ্রান্সিস ফোর্ড কপোলা (যাঁর ছবি ‘গডফাদার’) অথবা জর্জ লুকাস্‌ (যাঁর তৈরি ‘স্টার ওয়ার্স্‌’) — এঁদের আজ প্রযোজকের আশায় বসে থাকতে হয় না । পথ চেয়ে দিন গোনেন আজ কুরোসোওয়া, অর্সন্‌ ওয়েল্‌স্‌ প্রমুখ ।

কেবল প্রয়োগরীতি বা নন্দনতাত্ত্বিক চিন্তাতেই পরিচালক কালাতিপাত করবেন, সে-দিন চলে গেছে । ছবি তৈরীর টাকা জোগাড় থেকে বিজ্ঞাপনের খরচ ওঠানো পর্যন্ত সবই আজ তাঁর চিন্তার বিষয় । খুব কম জনই দিনের পর দিন এই তীব্র মানসিক চাপ সহ্য করেও সৃষ্টিশীল থাকতে পারেন দীর্ঘদিন । পাশ্চাত্য চলচ্চিত্র তাই এখন অনেক নিষ্প্রভ ।

এই মানসিক চাপের বিষময় পরিণতি খুব কাছ থেকে আমরাও দেখেছি শিল্পী ঋত্বিক ঘটকের জীবনে । অবশ্যই এ-এক চরম অবস্থা । হয়তো তিনি ধরে নিয়েছিলেন, আপসহীনতা মানেই কৌশলহীনতা । ফলে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে । আর শিল্পবোধহীন দর্শকসমাজ এদেশে সুস্থ চলচ্চিত্র -ভাবনা বিস্তারের পথে হয়তো সত্যি এক প্রধান অন্তরায়। কিন্তু এজন্য অগ্রবর্তী চলচ্চিত্র কর্মীদের লক্ষ্যভ্রষ্ট সাংগঠনিক কৌশলই অনেক বেশি দায়ী বলে মনে হয় । তবু ঋত্বিক ‘সারি সারি পাঁচিল’-এ দর্শককে স্থান দিলেন সর্বাগ্রে । তাঁর এই মনোভাবেরই প্রতিধ্বনি করেছেন আরও অনেকে — পরিচালক এবং শিল্পবোদ্ধা সমালোচকও ।
বিপরীত প্রতিত্রিয়াও লক্ষ্য করার মতো । দর্শকগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশ আজ সেই অগ্রবর্তী পরিচালক- সমালোচকের উন্নাসিকতার প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে নিজের শিল্পবোধহীনতার প্রসঙ্গটি অগ্রাহ্য করেছেন ।

পারস্পরিক সন্দেহ ও দোষারোপের ফলে ব্যাপারটি আজ একটা দুষ্টচত্রের পর্যায়ে চলে গেছে — বঞ্চনাই যেখানে নিয়ম ।আর, ভাবতে কষ্ট হলেও একথা মানতেই হয় যে চত্রটি সম্পূর্ণ হয়েছে সত্তর দশকেই ।

অথচ অনেক নতুন সম্ভাবনার কৌতুহলোদ্দীপক উন্মেষ দেখা গিয়েছে এই দশকের ছবিতেই । সমাজ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যানধারণার পুনর্মূল্যায়ন এবং নতুন ধারণার প্রবর্তনের সূত্রে বাংলার চিন্তারাজ্যে যে - আলোড়ন তুলেছিল নতুন এই দশক, তার প্রতিফলন এসেছিল চলচ্চিত্রেও । 'পথের পাঁচালী'র উত্তর পর্বে ষাটের দশক জুড়ে শিল্পসম্মত বাংলা ছবি তুলে ধরতো সমাজ বাস্তবতার এক সহনীয় রূপ । সেই রীতি পরিত্যক্ত হলো সত্তর দশকে । কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বাংলা ছবি স্বীকার করে নিলো সমাজদেহে সর্বব্যাপ্ত এক সংকটের অস্তিত্বকে। এমনকি রাজনীতি-ঘনিষ্ঠ যে-জীবন অথবা জীবনের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা, তাও আর ব্রাত্য থাকল না সিনেমার পর্দায় ।

এই দশকের উল্লেখযোগ্য চলচিচত্রের অধিকাংশই গড়ে উঠেছে একটি প্রতীককে কেন্দ্র করে ।প্রতীকটি অস্থির তণের ।স্বভাবতই স্বপ্নবিলাসী তণমনের ভবিষ্যৎ স্বপ্নকে পঙ্গু করে তখন অন্ধকারের গর্ভে ঠেলে দিচ্ছে পুঁজিবাদী সমাজের নানা সংকট ।এই বঞ্চনার নান জটিল প্রতিত্রিয়া ব্যত্ত হয়েছে সমাজজীবনে ।এবং ফলত চলচ্চিত্রেও ।

বঞ্চনার আত্রোশে অস্থির তণের এক অংশ মার্কসীয় তত্ত্ব- অনুসারী শ্রমিক-কৃষক নেতৃত্বাধীন সমাজ-পরিবর্তনের জঙ্গী আন্দোলনের শরিক হয়েছিল ।তাদের রূপ দেখি মৃণাল সেনের রাজনৈতিক ত্রয়ীতে । 'ইন্টারভিউ', 'কলকাতা ৭১' এবং 'পদাতিক' — ছবিগুলির প্রত্যেকটিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্র এক রাগী তণের । বিমূর্ত এই চরিত্রায়ণকে নানা স্তরে ব্যাখ্যা করেন মৃনাল সেন । 'ইন্টারভিউ'তে আছে অব্যবহিত এক বঞ্চনার প্রতিত্রিয়া । 'কলকাতা ৭১' - এ সেই প্রতিত্রিয়াকে এক ঐতিহসিক পরিপ্রেক্ষায় স্থাপনের চেষ্টা । ভবিষ্যতের বিপ্লব-স্বপ্নের অপূর্ণ সম্ভাবনায় চরিত্রটি পীড়িত হয় 'পদাতিক'- এ ।প্রতিটি উপস্থাপনাই অনিবার্যভাবে রাজনীতি-সম্পৃত্ত, প্রতিবাদমুখর ।অবশ্য সেই রাজনীতির ভাষ্য সেখানে প্রায়শই মধ্যবিত্ত-সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে ।

অস্থির তাণ্যের আর-এক চরম অভিব্যত্তি নানা অসামাজিক ত্রিয়ায় । ঘটনাটিকে তপন সিংহ প্রথম ধরেন তাঁর 'আপনজন ' ছবিতে, ১৯৬৮ সালে ।আর এরই বিস্তৃতি হিসেবে 'এখনই' এবং 'রাজা' ছবিতে যুবসামজের সেই মানসিকতার মূল অনুসন্ধানে তিনি পা বাড়ান, খেই হারিয়ে যদিও ছবিগুলি রূপান্তরিত হয় আবেগসর্বস্ব মেলোড্রামায় ।একই সমস্যা পার্থপ্রতিম চৌধুরীর 'যদু বংশ' ছবিতেও। কিন্তু 'আটাত্তর দিন পরে ' ছবিতে অজিত লাহিড়ী এ-ব্যাপারে তুলনামূলক ভাবে সফল। লুম্পেন -মনোবৃত্তির একটা সৎ, সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যার চেষ্টা এখানে চোখে পড়ে ।আর আবেগ ও যুত্তির মধ্যবর্তী অবস্থানে ভবিষ্যতহীন তাণ্যের রূপায়ণ ছিল পূর্ণেন্দু পত্রীর 'ছেড়া তমসুক ' ছবিতে, এবং ইন্দর সেনের ছবি ' অসময় ' আর 'পিকনিক'-এ ।

স্বভাবত সংযত শিল্পী সত্যজিৎ রায় অবশ্য যুগমানসিকতার দুই চরম প্রত্যন্তকেই এড়িয়ে যান ।অস্থির তাণ্যের সমস্যা নিয়ে তৈরি তাঁর ছবির চরিত্রগুলির কোনটিই রাজনীতি বিষয়ে উদাসীন নয়, কিন্তু তাদের প্রাত্যহিক জীবনে রাজনীতির স্থান নেই । তারা বিবেকবান, অথচ অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনে সামাজিক অন্যায়ের কোন-না- কোন ধারার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে, আর তারপর দগ্ধাতে থাকে ভেতরে ভেতরে ।তারা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে না, করে অবক্ষয়ের কাছে । 'অরণ্যের দিনরাত্রি' ছবিতে চারটি, 'সীমাবদ্ধ' ও 'জন-অরণ্য' ছবিতে একটি করে — এই ছয়টি চরিত্রই সেই জটিল আবর্তের শিকার । সত্যজিতের কাছে হয়তো ব্যত্তির অধঃপতনই সমাজিক অবক্ষয় ও অধোগমনের অগ্রদূত । 'প্রতিদ্বন্দ্বী' ছবিতে সেই জটিল আবর্ত জটিলতর হয় বিপরীতধর্মী কয়েকটি চরিত্রের সমান্তরাল উপস্থাপনায় ।অস্থির তাণ্যের বিভিন্ন অভিব্যত্তি এখানে আদিনাথ, সুতপা ও টুনুর মধ্যে ।এদের বিপরীতে অবস্থান সিদ্ধার্থ ও কেয়ার ।তাদের নিস্পাপ রোম্যান্টিকতাই বোধহয় অস্থির তাণ্যের যুগে সত্যজিতের অন্বিষ্ট ।

বলা বাহুল্য, মধ্যবিত্ত জীবনকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে এইসব ছবি ।ভরকেন্দ্র হিসেবে এসেছে তণের সমস্যা ।আর ছবিগুলির সবই যে পরিচালকের খুব সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক, তাও নয় । তবু, বাংলা সিনেমার কিছু বাঁধা ছক থেকে যে তাঁরা বেরিয়ে এসেছিলেন, এবং আরও বেশি বেশি ছবিতে, সেটাই এই প্রবণতার সুফল ।দীর্ঘ তিরিশ বছর ধরে মেলোড্রামাটিক প্রেমের কাহিনী, সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের গুণগান এবং ধর্মীয় পৌরাণিক উপাখ্যানের মোহে বুঁদ হয়ে থাকা বাংলা সিনেমার জগতে সমকালীনতার এই অভিঘাত বিশেষ গুত্বের দাবী করে বৈকি ।এমনকি পুরোপুরি বাণিজ্যের মুখ চেয়ে তৈরী বহু ছবিতেও সমকালীনতার কিছু 'পাঞ্চ্' সত্তর দশকে লক্ষ্য করার মতো ।

স্পষ্টতই এসব ছবি এক উত্তাল সময়ের প্রতিক্রিয়া । রাজনৈতিক উত্তেজনা কিছুটা কমে আসার পর মধ্যবিত্ত জীবনের আরও কিছু সমস্যার প্রতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সমাজসচেতন কয়েক জন পরিচালক বোঝাতে চাইলেন, সংকট আসলে মধ্যবিত্ত জীবনের সর্বত্র । 'দূরত্ব' ছবিতে বুদ্ধদেব দাসগুপ্ত অথবা ' দৌড়' - এ শংকর ভট্টাচার্য দুটি তণ চরিত্রকে কেন্দ্রে রেখেও মধ্যবিত্ত জীবনের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । সত্যজিতের মতো কোন তথাকথিত আদর্শ যুবমানসের অন্বেষণ নয়, বরং যুবমানসের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডী সীমায়িত হয়ে যায় তাঁদের ছবিতে। যে -শ্রেণীর প্রতিভূ এই যুবকদ্বয়, সেই মধ্যবিত্ত জীবনের কিছু সংস্কার কীভাবে যে যুবাসুলভ রোমান্টিকতাকেও আছন্ন করে ফেলে, তারই বিশ্লেষণ করেছেন এঁরা। 'দুরত্ব' ছবিতে কেন্দ্রীয় বিষয় নারী-পুষ সম্পর্ক। মানবজীবনের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ক্ষেত্রে নায়কের যৌবন ও রাজনৈতিক আদর্শের পথরোধ করে দাঁড়ায় তার মধ্যবিত্ত সংস্কার। আর 'দৌড়' ছবিতে যুবকের পলায়ন-প্রবণতা , তার মূল্যবোধের অনিবার্য সীমাবদ্ধতা রূপায়িত হয় তথাকথিত বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর নৃশংসতার সমান্তরালে ।

সৈকত ভট্টাচার্যের 'অবতার' এবং অজিত লাহিড়ীর 'সম্রাট' ছবি দুটি তুলে ধরলো মধ্যবিত্ত সুবিধাবাদের রূপ ।আর নয়া ঔপনিবেশিক শোষণের পরিবেশে মধ্যবিত্ত অস্তিত্বের সংকট ধরা পড়ে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের দ্বিতীয় ছবি 'নিম অন্নপূর্ণা'য় । কমল মজুমদারের গল্পে ১৩৫০- এর মন্বন্তরের যে পরিপ্রেক্ষিত ছিল, বুদ্ধদেব তাকে সমসাময়িক পরিপ্রেক্ষিতে রূপান্তরিত করেন ।এই একই বিষয় নিয়ে লেখা বিভূতিভূষণের 'অশনি সংকেত' গল্পের সময়কে অবশ্য সত্যজিৎ রায় অপরিবর্তিতই রেখেছিলেন । তবুও বর্তমান সংকটের কোন কাঙ্খিত ঐতিহাসিক সূত্র সেখানে পাওয়া যায় নি । 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' ছবিতে হতাশ, অবক্ষয়কবলিত শিল্পীর যে রূপটি ঋত্বিক দেখিয়েছেন, আবেগ-উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য সত্ত্বেও তাকে অবশ্য মধ্যবিত্ত সংকটের এক চরম পরিণতি বলে মানতে কোন অসুবিধে হয় না আমাদের । আর পরিমিত আবেগের আশ্রয়ে মধ্যবিত্ত সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে দ্বশ্বাস উত্তেজনার সৃষ্টি করেন মৃণাল সেন তাঁর 'একদিন প্রতিদিন ' ছবিতে।

মধ্যবিত্ত জীবনবৃত্তের বাইরে গিয়ে সমাজবাস্তবতার সৎ রূপায়ণের দৃষ্টান্ত পঞ্চাশ বা ষাটের দশকেও যতটা দুর্লভ ছিল, সত্তর দশকে আর ততটা নয় । এবং এটিও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ।এই তালিকায় একদিকে পাই 'একলব্য' পরিচালিত 'সাধু-যুধিষ্ঠিরের কড়চা,' তণ মজুমদারের 'সংসার সীমান্তে', বিজয় চট্টপাধ্যায়ের 'বারবধূ' -র মত ছবি । লক্ষণীয়, বঞ্চিত মধ্যবিত্তের লুম্পেন মানসিকতা নয়, সত্যিকারের লুম্পেনদের নিয়েই এসব ছবির কাহিনী। সমাজের এইসব অন্ধকার প্রকোষ্ঠের কোন বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ না করেও এসব ছবিতে তুলে ধরা হয়েছে সেখানকার জীবন ।আর অন্য একদিকে, অপরাধ প্রবণতার একটু ভিন্নতর ছক পাই সত্যজিৎ রায়ের তৈরি গোয়েন্দা-চিত্র 'সোনার কেল্লা' এবং 'জয় বাবা ফেলুনাধ' -এ । ব্যাপক কোন সামাজিক তাৎপর্যের সন্ধানে না গিয়েও বর্মন-বোস আর মগনলাল-মছলিবাবার মধ্যে অপরাধীর যে-রূপ তিনি দেখাতে চান, সমাজবীক্ষণের একটি বৈশিষ্ট্য তাতে ধরা পড়ে বৈকি। ধরা পড়ে এমনকি তপন সিংহের 'এক যে ছিল দেশ' ছবিতেও । অথচ এইসব অসামাজিক ক্রিয়ার স্থুল চিত্রণকে পণ্য করে বহু বাণিজ্যিক ছবিই তৈরী হয়েছে গত দশ বছরে, ছড়িয়েছে চিবিকৃতির বিষ ।

মধ্যবিত্ত জীবন ও আন্ডারওয়ার্ল্ডের মধ্যবর্তী স্তরটি শিল্পসম্মত ভাবে ধরা পড়ে মাত্র দুটি ছবিতে — একটি মৃণাল সেনের 'পরশুরাম', অপরটি ঋত্বিক ঘটকের 'তিতাস একটি নদীর নাম'। 'পরশুরাম' ছবিতে অবশ্য প্রাধান্য পেয়েছে জমি থেকে উৎখাত হওয়া ক্ষেতমজুরের শহুরে লুম্পেনের জীবনে রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়াটিই । 'তিতাস একটি নদীর নাম' এ ঋত্বিক দেখিয়েছিলেন, ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে কীভাবে পরিবর্তিত হয়ে আসে মালো সমাজের আদিম রূপ ।

এইসব আংশিক বিশ্লেষণের বিপরীতে মৃণাল সেনের 'কোরাস' ছবিটিতে ব্যাপক ভাবে সমাজ-বিশ্লেষণের একটা চেষ্টা ছিল । কিন্তু বিষয়বস্তু এবং গঠনের জটিলতা এ-ছবির আবেদনকে ভীষনভাবে ক্ষুণ্ণ করেছিল ।

লক্ষ্য করার বিষয়, সত্তর দশকের বাংলা চলচ্চিত্র জগতের শিল্পপ্রয়াসের তালিকাটি এখানেই প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে আসে— বাকি থাকে শুধু পূর্ণেন্দু পত্রীরই দুটি ছবি, 'স্ত্রীর পত্র' এবং 'মালঞ্চ', যে দুটিই রবীন্দ্রকাহিনীর চলচ্চিত্রস্বরূপ। কেউ হয়তো এ-তালিকায় যোগ করতে চাইবেন রবি ঘোষের 'নিধিরাম সর্দার', রাজেন তরফদারের 'পালঙ্ক' আর নির্মল মিত্রের 'পরিচয় ' ছবিগুলিও । তবু, গত দশ বছরে তৈরি প্রায় সাড়ে তিনশ' ছবির ভীড়ে শিল্পগুণান্বিত তিরিশটি ছবির এই তালিকা নিশ্চিত গর্ববোধ করার মতো কিছু নয় ।আশার কথা এটুকুই যে, ষাটের দশকের তুলনায় শিল্পমনস্ক পরিচালকের সংখ্যা এবার কিছু বেড়েছে । এবং এটাও উল্লেখ করার মতো বিষয়

নিশ্চয়ই, শিল্প যে রাজনীতিবর্জিত, সমাজবিচ্ছিন্ন বিমূর্ত কোন ব্যাপার নয়, ছবিগুলি এখন তারই প্রত্যক্ষ- পরোক্ষ স্বীকৃতি।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে সেই দুষ্টচক্রের বিষয়টি। শিল্পীর উপরোক্ত স্বীকৃতিকে সাধারণ দর্শক খুব বেশি মূল্য কি দিয়েছেন ? সমসাময়িক জীবনের কিছু মৌল সমস্যা, যা কোন- না-কোনভাবে সকলকেই আঘাত করে, তাই ত তুলে ধরা হয়েছে এসব ছবিতে। তবু অধিকাংশই বক্স অফিসের হিসেবে ব্যর্থ। যেখানে সফল হয়েছে তপন সিংহের 'হারমোনিয়াম'— সমস্যার এক অতিসরলীকৃত রূপ, সফল হয়েছে অবাস্তব প্রেমের ততোধিক অবাস্তব চিত্রায়ণ তণ মজুমদারের 'ফুলেশ্বরী' অথবা তাঁর 'গণদেবতা', গ্রামীণ সমাজপ্রবাহের এপিককে কুচিপূর্ণ যাত্রায় রূপান্তরিত করার এক উদ্ধত প্রয়াস ।'বাবা তারকনাথ' - এর কথা ত ছেড়েই দিচ্ছি, ছেড়ে দিচ্ছি হিন্দী ছবির আদলে তৈরী 'অমানুষ'গ্ধ, 'আনন্দ আশ্রম' ছবির আকাশছোঁয়া জনপ্রিয়তার কথা।

শুতে দেওয়া ব্রিটেনের পরিসংখ্যান বিচ্ছিন্ন কোন উদাহরণ ত নয় ।অঙ্কগুলো সামান্য রদবদল করে নিলেই বোঝা যাবে, বাংলার দর্শকগোষ্ঠীর অবস্থা। বাংলায় কিংবা ব্রিটেনে—তণ দর্শকই সিনেমার সবচেয়ে প্রভাবশালী পৃষ্ঠপোষক ।অথচ তাঁরাই শিল্পবিমুখ, প্রধ ানত ! যুবসমাজের যে বিরাট অংশ বিপ্লবের আকাঙ্খায় একদিন জীবনপণ করেছিলেন, এমনকি তাঁরাও ব্যর্থ হয়েছেন গত দশ বছরের শিল্পের রসাস্বাদনে ।

একপেশে বিচার এ-সমস্যার সূত্র ধরা যায় না অবশ্য। সমাজতত্ত্বের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একে বিচার করতে হবে ।বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে আমরা সমস্যাটির একটি রূপরেখা দেওয়ার চেষ্টা করবো শুধু, শিল্প ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে ।তারপর তার সূক্ষ্মতর ত াৎপর্য ও ব্যাখ্যা আবিষ্কার কন সমাজ তাত্ত্বিকেরা ।

সংযোগ যেমন দ্বৈতনির্ভর এক প্রক্রিয়া, সংযোগের অভাবও ঠিক তাই ।সত্তর দশকে বাংলার চলচ্চিত্রজগতে শিল্পী ও উপভোক্তার মধ্যে সংযোগের এই অভাব যে অলঙ্ঘ্য এক দূরত্বে পর্যবসিত হলো, তা দীর্ঘস্থায়ী এক ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ারই পরিণতি ।

চল্লিশ, পঞ্চাশ, এমনকি ষাটের দশকেও বহুদিন পর্যন্ত বাংলা ছবির জগতে একটি পরিচ্ছন্ন বিনোদনের হাওয়া বয়েছিল ।ভিত্তি ছিল দর্শক-পরিচালকের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ।চাহিদা-যোগানের একটা ভারসাম্য তৈরি হয়েছিল সেখানে ।তবে পরিচ্ছন্ন অর্থে সম াজবিশ্লেষণ বা সমাজপ্রগতির সপক্ষে অবশ্যই নয় ।সামাজিক সমস্যা বা সংকটের ছায়া না মাড়ানোর তাগিদই ছিল অধিকাংশ ছবিতে প্রবল — এটা হয়তো তখনকার একটা আপাত সামাজিক স্থিতিরই প্রতিফলন। সামান্য কয়েকটি ছবিতে দেখা যেত ব্যক্তিগত স্বার্থের দ্বন্দ্বে বানিয়ে তোলা 'সমস্যা' ।এদের সমাধানে হৃদয়াবেগের আলোড়নই যথেষ্ট ।ছবিগুলি পরিচ্ছন্ন এই কারণে যে, মধ্যবিত্ত মূল্যবে াধের গণ্ডী ছাড়িয়ে জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়ার মত্ততায় মাতে নি সেইসব ছবি ।বছরে যে চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছবি তৈরি হতো তখন, দর্শকচিকে উন্নত না কক, ছবিগুলি তাকে অধোগমনের পথে ঠেলে দেয় নি কখনোই ।মধ্যবিত্ত চির এক সীমায়িত বৃত্তে ঘুরপাক খেয়েই দর্শককে সন্তুষ্ট রেখেছে শুধু।
এমনই সেই সন্তুষ্টিবিধান যে, দর্শকের চোখ এড়িয়ে গেছে সেসব ছবির নান্দনিক সূক্ষ্মতার অভাব; বিশেষ করে চলচ্চিত্রের ভাষায় ত াদের দুর্বলতা ।হলিউড-এর তারকাপ্রথার দেশজ এক বিকৃত সংস্করণ এই দুর্বলতার মূল উৎস বলে মনে হয় ।তারকাখচিত হলিউড ছবিতে তবু মাঝে মাঝে পাওয়া যেত নান্দনিক সূক্ষ্মতার কিছু আভাস ।কিন্তু বাংলা 'টলিউড'-এ তারকাই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ।পরিচ ালকের সমস্ত মনোযোগ তাঁরই ওপর নিবদ্ধ ।আর পরিবেশের সমস্তটাই কৃত্রিমতায় ভরা — স্পটলাইটে চাঁদ,প্লাস্টিকের ফুলপাতা, থিয়েটারি কায়দায় ঝোলানো সীন ইত্যাদি। চলচ্চিত্রের ভাষা সম্পর্কে দর্শকের চাহিদাই তৈরি হয় নি কখনও।

প্রা উঠতে পারে, হলিউডে যদি তারকাপ্রথা এবং শিল্পসমৃদ্ধি দুইই চলতে পারে পাশাপাশি, 'টলিউড'-এর অনুরূপ প্রয়াস কেন পর্যবসিত হলো ব্যর্থ অনুকরণে? এর সহজ উত্তর পরিমণ্ডলের তারতম্য। পাশ্চাত্য চলচ্চিত্রজগৎ শিল্পঐতিহ্যের যে উত্তরাধিকারে পুষ্ট হয়েছিল, তেমন নিজস্ব কোন ঐতিহ্যের স্বাদ পায় নি বাংলার তথা ভারতের চলচ্চিত্র জগৎ ।সাহিত্য ও চাকলার বিভিন্ন রীতি, যেমন ইম্প্রেশনিজ্‌ম্, সাররিয়ালিজ্‌ম্, কিউবিজ্‌ম্, চৈতন্যপ্রবাহ ইত্যাদির পথ বেয়ে চলচ্চিত্রের ভাষা খুঁজে পেয়েছে তার নিজভূমি। বিভিন্ন শিল্পমাধ্যমের এইসব রীতি ছিল চলচ্চিত্র ভাষার প্রাথমিক উপাদান ।এসব রীতি ভারতের শিল্পকলায় কখনও আসেনি এমন নয়, কিন্তু সমস্তটাই পাশ্চাত্যের অনুকরণে ।বিদেশে স্বাভাবিক এক বিকাশের ধারাতেই প্রাণ পেয়েছে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ, এমনকি বাণিজ্যিক পরিমণ্ডলেও ।মনে রাখা দরকার, পাচাত্যে বাণিজ্য ও শিল্পের দ্বন্দ্বটি অনেক বেশি জটিল, যেটি আবার জটিল এক সমাজব্যবস্থারই ফল। তাই পাশ্চাত্যে বাণিজ্যিক ছবিমাত্রেই শিল্পহীন, এমন নয় ।

স্বভাবতই, বাংলায় শিল্প-ইতিহাস বিকাশের এই ধারার অভাবজনিত যে পরিপ্রেক্ষিত, তাতে চলচ্চিত্রের আবির্ভাবকে বলা চলে এক নিরালম্ব বায়ুভূতের অনুপ্রবেশ । বাণিজ্য ও শিল্পের যে দ্বন্দ্বটি প্রথম থেকেই যথেষ্ট জটিল অবস্থায় বিরাজ করছিল পাশ্চাত্যে, এখানে দীর্ঘদিন কোন প্রভাবই পড়ে নি তার । পাল্লা একতরফা হেলানো ছিল মুনাফা ব্যবসায়ীরই দিকে । ভারতীয় শিল্পঐতিহ্যের ধারকবাহক কেউ চেষ্টাও করেন নি শিল্প-মাধ্যমটিকে আত্মস্থ করার। ভারতীয় ছবিতে শিল্পহীনতার বিদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ তাই উচচারিত হলো পাশ্চাত্য-চলচিচত্র আদর্শে উদ্বুদ্ধ সংখ্যালঘু এক দর্শকগোষ্ঠীর মুখে, এই বাংলায় । সেই প্রতিবাদের সার্থক সূচনা ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটির গোড়াপত্তনে, আর প্রথম সার্থক পরিণতি সত্যজিৎ রায়ের ‘পথের পাঁচালি ’ ছবিতে । ‘বাণিজ্য বনাম শিল্প’ দ্বন্দ্বের সূত্রপাতও এইখানেই । তারপর সত্যজিতের ক্রমবর্দ্ধমান খ্যাতি, ঋত্বিক,মৃণাল এবং আরও দু-একজনের আবির্ভাব— সব মিলিয়ে প্রকট হয় দ্বন্দ্বটি । তবু আমাদের সামাজিক পরিমণ্ডলে এই দ্বন্দ্বটি অনেক বেশি সরল । এ-কেবল সাদাক ালোর অনিবার্য বৈপরীত্যের সঙ্গেই যেন তুলনীয়। আর এ-দ্বন্দ্বের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা ছবির শিল্প-ঐতিহ্যের প্রসঙ্গটিরও মীমাংসা হয়ে গেল, অন্তত কিছুদিনের জন্য ত বটেই । বোঝা গেল, পাশ্চাত্যের শিল্পগুণাশ্রিত চলচিচত্ররীতির অনুসরণেই বাংলা চলচিচত্রশিল্প (art অর্থে) পথ খুঁজে নেবে নিজের। শিল্পের এই প্রক্ষিপ্ত উদ্‌ভাসের ফলেই ‘পরিচছন্ন’ মধ্যবিত্ত বিনোদনের মোহ কাটাতে পারেনি এখানকার দর্শক । ভীড় করে ‘পথের পাঁচালী’ দেখার পরেও সুচিত্রা-উত্তমের ছবিই তাঁদের কাছে সিনেমার আদর্শ হয়ে থেকেছে ।

বোঝা যায়, আবেগ-অনুভূতির যেসব পর্দা ছিল সেই বিনোদনের নির্ভর, ভারতীয় চৈতন্যের সঙ্গে সেগুলি সুসামঞ্জস। অথচ বাংলা সিনেমার শিল্পযুগের সূচনা যেসব ছবিতে, তার অধিকাংশই পাশ্চাত্য মননের রীতি অনুসারী। অপু-ত্রয়ীতে ব্যক্ত জীবনপ্রবাহের ধারণা, ‘অযান্ত্রিক’-এর ফ্যান্টাসি বা ‘বাইশে শ্রাবণ’- এর বক্তব্য, সবই সাধারণ ভারতীয় চৈতন্যের পক্ষে অভিনব । এসব ছবির বিদ্ধে উঠল গল্পহীনতার অভিযোগ । আসলে, এখানে গল্প যে কখন কোথা দিয়ে তৈরি হয়ে গেল, বুঝতে পারেন নি সেদিনের দর্শক । অপর্ণার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সংবাদবাহী শ্যালকের মুখে অপুর প্রচন্ড আঘাতের দৃশ্যে তাঁরা বিভ্রান্ত, বিরক্ত হয়েছিলেন । প্রেমিকের শূন্যতাবোধের যে গভীর বিশ্লেষণটি চলচিচত্রের ভাষায় এখানে সহজে রূপ পেল, যে কোন সাহিত্যে যার জন্য খরচ হতো কয়েকটি পাতা, সেটি চোখে পড়লো না তাঁদের ।

ষাটের দশকে এইরকম ‘আঘাত’ আরও এলো, —ঋত্বিক ঘটক, পূর্ণেন্দু পত্রী, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম চৌধুরী, রাজেন তরফদার, হরিসাধন দাশগুপ্ত প্রমুখের উদ্যোগে। বাঙালীর শিল্পচেতনায় চলচিচত্রবোধের আত্মীকরণ সম্পূর্ণ (বলা ভালো, শু) হওয়ার আগেই প্রক্ষিপ্ত এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মোটেই উৎসাহী হলেন না দর্শক। এসব তাঁদের কাছে নিছক বুদ্ধির কারসাজি। তাঁরা প্রত্যাখ্যান করলেন । ফলে বাংলা চলচিচত্রে শিল্পবোধ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসটি দৃঢ় ভিত্তির অভাবে (অর্থাৎ গণসমর্থনের অভাবে) একটা ব্যাপক আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার বদলে জড়িয়ে পড়লো সমস্যার জটিল আবর্তে। তাগিদটা নিশ্চয়ই ছিল বিশ্বচলচিচত্রের সঙ্গে সমানতালে পা ফেলার । কিন্তু পরিবেশ-নিরপেক্ষভাবে শুধু এই একটিমাত্র তাড়নায় দর্শকের গ্রহণক্ষমতার অতিরিক্ত পসরা সাজালেন পরিচালক । তারপর সমূলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পরবর্তী পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা বিকাশের পথটাই দ্ধ হয়ে গেল অধিকাংশের সামনে ।

জনচির তৎকালীন স্তর এবং মুষ্টিমেয় চলচিচত্র শিল্পীর চলচিচত্রবোধের এই যে বিরাট ব্যবধান, এরই জন্য পঞ্চাশ এবং ষাটের দশকে শিল্পপ্রয়াসটি জনগণবিচিছন্ন হয়ে পড়েছিল । সমস্যার মূল দিক এইটেই যে চলচিচত্রভাষায় দর্শকের অনভিজ্ঞতার দণ সে সব ছবি তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট সুবোধ্য হতো না। ব্যবধান ঘোচাতে, সেতুবন্ধনে উদ্যোগী কোন মধ্যবর্তী সংগঠন ছিল অপরিহার্য । এই সেতুবন্ধনের ভিত্তি — চলচিচত্রভাষার স্বরূপ ও তাৎপর্যকে দর্শকের সামনে বারবার তুলে ধরা, সুস্থ চলচিচত্রচর্চায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করা, সহানুভূতির সঙ্গে দর্শকের চিবিকারের সমালোচনা ক রা এবং অতি - অগ্রসর শিল্পীর প্রতি সংযমের আহ্বান রাখা । ফিল্ম সোসাইটি ও তার উদ্যোক্তারা নিতে পারতেন এ-বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা । ফিল্ম সোসাইটি আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে সেই ভূমিকা পালনে তাঁদের ব্যর্থতা এখানেই ।

১৯৬৫ সালে কলকাতায় ভারতের তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচিচত্র-উৎসবের পর ষাটের দশকের শেষদিকে এই আন্দোলনে যখন নতুন জোয়ার এলো, তখন অবশ্য জনগণমুখিনতার একটা আভাস খানিকটা ছিল । অল্প সময়ের মধ্যেই ফিল্ম সোসাইটির সংখ্যা ও তার সদস্যসংখ্যা বেড়ে গেল দ্রুতহারে, পত্রপত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে সূচনা হলো মননশীল চলচিচত্রচর্চার । কিন্তু সত্তর দশকের মাঝামাঝি পৌঁছে আন্দোলনের এই পর্যায়ে চলে এলো সংকীর্ণতা ।

ফল হলো বিষময় । বাংলার তণ দর্শকগোষ্ঠী—সিনেমা দর্শকের সংখ্যাগরিষ্ঠ যে অংশ —বাংলা বাণিজ্যিক ছবিগুলির চর্বিতচর্বন ও অবাস্তবতায় বিরক্ত হয়ে ক্রমশ আকৃষ্ট হচ্ছিলেন ততোধিক অবাস্তব হিন্দী ছবির প্রতি। এই আকর্ষণ ক্রমে রূপান্তরিত হলো নেশায় ।তণ মনের ঝোঁকটা যে প্রধানত সিনেমার কারিগরি পারিপাট্যের দিকেই, তাতে সন্দেহ নেই ।এটা ধরতে পেরেই হিন্দী ছবি দুপায়ে ভর করে দাঁড়িয়েছে। তারকাপ্রথার পাশাপাশি সেখানো ঘটানো হলো বিচিত্র ও অত্যাধুনিক কারিগরি কৌশলের সমাবেশ । এই অভূতপূর্ব অগ্রগতির যুগেও বাংলা ছবি বিষয়টিকে একরকম উপেক্ষা করেই একপায়ে দাঁড়িয়ে বাহবা নেওয়ার 'মহৎ' প্রতিজ্ঞায় অটল থেকেছে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বসু, নীতিন বসু প্রমুখের মতো উদ্ভাবনী ক্ষমতাসম্পন্ন একজন পরিচালকেরও দেখা পায় নি বাণিজ্যিক বাংলা ছবি ।ফল ঃ বন্ধ্যাত্ব ও দর্শকের প্রত্যাখ্যান ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে শিল্পগুণান্বিত ছবিগুলি কেন আনুকূল্য লাভ করলো না এই তণ দর্শকগোষ্ঠীর? এগুলিতে ত অনুপস্থিত নয় প্রকরণগত পারিপাট্য ! কিন্তু, 'কোরাস', 'পদাতিক', বা 'জন-অরণ্য' ছবিগুলির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য তথা পারিপাট্য তাদের বিষয়ের সঙ্গে যেভাবে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে জড়িত, তার রহস্য-উদ্ধার ব্যাপক মস্তিষ্ক চর্চার ওপর নির্ভরশীল ।এর বিপরীতে 'ববি', 'শোলে'-র বাহাদুর কা খেল্ জাতীয় কাহিনীর সঙ্গে সেইসব ছবির কারিগরি কৌশলের সম্পর্ক নির্ধারণ করতে সাধারণ বোধই যথেষ্ট— আর এই সাধারণ বোধই দর্শককে বলে দেয় যে এর মধ্যে অনেকটাই অতিরঞ্জন ।তার পর থাকে শুধু চিন্তাহীন অভিভূত হওয়ার পালা। এখানেও মুস্কিল বাধায় শিল্পসম্মত ছবি। সত্যজিৎ-মৃণাল অতিরঞ্জনও পরিহার করেন, অথচ দর্শককে অভিভূত করতেও ব্যর্থ হন !

সত্তর দশকের বাংলা ছবিতে মোড় পরিবর্তনের একমাত্র নেতিবাচক দিক এইটেই যে, শিল্পমনস্ক পরিচালকরা তৈরী করেছেন এমন ছবি, যা কেবল মননকেই নাড়া দেয় । 'মহানগর'-এর নায়কের মতো আর শান্ত থাকতে পারে না সত্তর দশকের 'প্রতিদ্বন্দ্বী' সিদ্ধার্থ । 'মেঘে ঢাকা তারা'-র যন্ত্রণা রূপান্তরিত হয় 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো'র শাণিত বিতর্কে । 'বাইশে শ্রাবণ'-এ পুঞ্জিত বেদনা ফেটে পড়ে ক্রোধে, এমনকি তার উত্তাপ অনুভূত হয় 'একদিন প্রতিদিন'-এর মতো নিচচার শিল্পকর্মেও। ভারতীয় চৈতন্যের সঙ্গে এসব অনুভূতির অসামঞ্জস্য হয়তো সত্তরের দশকে (মার্ক্স্-লেনিন-মাও-সে-তুঙ অনুপ্রাণিত বাংলায়) আর তেমন সমস্যার বিষয় হতো না, যদি অন্তত চলচ্চিত্র ভাষায় অভিজ্ঞ হতেন দর্শক ।এই অভিজ্ঞতার অভাবে সাধারণ দর্শক আর শিল্পমনস্ক পরিচালকের ব্যবধান সত্তরের দশকে রূপান্তরিত হলো অলঙঘ্য এক দূরত্বে ।

এই পরিস্থিতিতে চলচ্চিত্রের উৎসাহী প্রবক্তাদেরও দেখা গেছে মননির্ভর ছবির গুগম্ভীর সমালোচনায় ব্যস্ত থাকতে । বুদ্ধির ব্যায়ামের অভ্যাসটাকে বজায় রাখতে সাহায্য করছে বলেই হয়তো বুদ্ধিজীবী হিসাবে ছবিগুলির প্রতি তাঁদের পক্ষপাত । তাঁদের এই সিনেমাপ্রীতিতে যদি বাংলা ছবির ভবিষ্যৎ-চিন্তাও স্থান পেত, তাহলে অবশ্য এই ভয়ংকর খেলার ক্ষতিকর দিকটি সম্পর্কে তাঁরাই সচেতন হতেন সবচেয়ে আগে । তাঁরা সচেতন হন নি বলেই বাংলার সাধারণ দর্শককেও বোঝানো যায় নি তপন সিংহ, অজয় কর, তণ মজুমদার, পীযুষ বসু, সলিল দত্ত প্রমুখ জনপ্রিয় পরিচালকের তৈরি সত্তর দশকের ছবিগুলির দুর্বলতা। তাঁরা সচেতন হন নি বলেই বাংলার সাধারণ দর্শকের অপরিণত চলচ্চিত্রবোধের সঙ্গে সত্যজিৎ-মৃণাল-ঋত্বিকের সত্তরের দশকে তোলা ছবিগুলির দুস্তর ব্যবধানের বিষয়টি কোন সুস্থ সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে নি।

শুধু ভালো ছবির সংজ্ঞানির্ধারণ বা প্রশংসাতেই বোধ হয় শেষ হওয়ার নয় চলচ্চিত্র-সংস্কৃতি প্রসারের কাজ । শিল্পসমালোচক আর্নল্ড্ হাউসারের কিছু প্রাসঙ্গিক উক্তি স্মরণ করি ঃ '... the broad masses of the people have [not] at any time taken a stand against qualitatively good art in favour of inferior art on principle... They take an interest in the artistically valuable, provided it is presented so as to suit their mentality, that is provided the subject matter is attractive... The problem is not to confine art to the present-day horizon of the broad masses, but to extend the horizon of the masses as much as possible.' সময়সাপেক্ষ প্রয়াস সন্দেহ নেই । কিন্তু সাধ্যাতীত কি ?

আশার কথা বুদ্ধিজীবী সমালোচক বুদ্ধির চর্চায় যতই ব্যস্ত থাকুন, সংযোগের অভাবজনিত এই পরিস্থিতি বিষয়ে পরিচালকরা কিন্তু সচেতন হয়েছেন ।এই দশকের শেষভাগেই দেখা গেল, সচেতন হয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা সচেতন হলে আমাদের লাভ ।তাই যখন দেখি সত্যজিৎ রায় ফিল্মের এন্টারটেন্মেন্ট ভ্যালুকেও গুত্ব দিচ্ছেন, মৃণাল সেন সহজ করছেন তাঁর ছবির ভাষা, তখন মনে হয় বাংলা চলচ্চিত্রের গণমাধ্যম হয়ে ওঠার পথটি তাহলে এখনও বন্ধ হয়ে যায় নি।